**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1529-1535
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.374**

# ভারতীয় দর্শনে বিবর্তন ও প্রকাশ: সাংখ্য, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শ্রী অরবিন্দের তুলনামূলক অধ্যয়ন

**সম্পা দত্ত,** *স্বাধীন গবেষক, বাঁকুড়া, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

The concept of evolution occupies a central yet distinct place in Indian philosophical traditions, particularly in Sāṅkhya, Viśiṣṭādvaita Vedānta, and the integral philosophy of Sri Aurobindo. In Sāṅkhya, evolution (pariṇāma) is understood as a systematic unfolding of Prakṛti, driven by the proximity of Puruṣa, resulting in a hierarchical manifestation from subtle to gross elements. Viśiṣṭādvaita Vedānta reinterprets evolution as a real transformation of Brahman, where the universe and individual souls are modes (prakāra) of a personal, qualified Absolute, emphasizing divine immanence and teleology. Sri Aurobindo, drawing from both classical and modern insights, advances a dynamic and spiritualized vision of evolution, wherein consciousness progressively manifests from matter to life, mind, and ultimately to the supramental realization. While Sāṅkhya presents a dualistic and mechanical model, Viśiṣṭādvaita integrates evolution within a theistic and purposive framework, and Sri Aurobindo offers a synthesis that is both evolutionary and transcendental. This comparative study highlights the continuity and transformation of evolutionary thought within Indian philosophy, revealing a movement from metaphysical analysis to spiritual teleology and integral realization.

**Keywords:** Consciousness, Evolution, Sankhya, Sri Aurobindo, Visistadvaitavedanta

বিবর্তনবাদ হল জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত একটি মতবাদ। বিবর্তনবাদ অনুসারে এই জগৎ আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি। জগতের জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে মানুষ সকলেই এক সহজ-সরল আদিম অবস্থা থেকে বিকশিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এবং এই বিবর্তন ধারা অগ্রসর হয়ে চলেছে নিরন্তর। এই জগৎ এক অবিরাম পরিবর্তন প্রবাহ। আর এই পরিবর্তন ধারায় নিয়ত বদল হচ্ছে জগৎ, জীবন তথা সমাজের সবকিছু।

এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবর্তনের ধারনা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে বিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন বিবর্তন যান্ত্রিক, কেউ বলেন উদ্দেশ্যেমূলক, কারও মতে বিবর্তন সৃষ্টিশীল, আবার কেউ বলেন এটি উন্মেষমূলক। ভারতীয় দর্শনও এর ব্যতিক্রম নয়। বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। সাংখ্য দর্শনে অচেতন, নিরবয়ব প্রকৃতি সচেতন আত্মা বা পুরুষের সংস্পর্শের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত ব্রহ্ম বিবর্তবাদের কথা বলে যেখানে ব্রহ্মের উপর জগৎ বা মায়ার মিথ্যা রূপান্তরকে বোঝায়। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম থেকে চিৎ অর্থাৎ জীব এবং অচিৎ অর্থাৎ জড়তে

রূপান্তরের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা রয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন পরমাণুসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা করে। আবার অরবিন্দ দর্শনে বিবর্তনবাদ হল জড় থেকে জীবে এবং জীব থেকে অতিমানস স্তরে রূপান্তরের একটি আধ্যাত্মিক পথ। বর্তমানে আমরা সাংখ্য দর্শন, বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ও শ্রী অরবিন্দ দর্শনে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করব।

**সাংখ্য দর্শনে বিবর্তনবাদ:**

সাংখ্য বিবর্তন তত্ত্ব হল মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, যা প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (চৈতন্য) এর পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা করে। সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী। তাই এখানে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে– প্রকৃতি এবং পুরুষ। এককথায় সাংখ্য বিবর্তনবাদ হল প্রকৃতি পরিণামবাদ। প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থে বলেছেন–

"ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিত: প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্যবিভাগাদবিভাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য।।"[১]

১. সাংখ্য মতে কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হয়। তাই মহৎ ইত্যাদি কার্য বস্তুর কারণ রূপে অব্যক্ত প্রকৃতিকে স্বীকার করতে হয়।

২. জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই সত্ত্ব, রজ: ও তম: গুণের সমন্বয় ঘটে। সুতরাং সত্ত্ব, রজ: ও তম: গুণ যুক্ত কোনো বিশেষ কারণ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিশেষ কারণই হল প্রকৃতি।

৩. যেকোনো সৃষ্ট বস্তু তার উপাদান কারণে অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। জগৎ সৃষ্টির সেই অব্যক্ত শক্তি হল প্রকৃতি।

৪. 'কারণকার্যবিভাগাৎ'- কারণ থেকে কার্যের বিভাগ হয়, অভিব্যক্তি হয় ও ভিন্ন রূপে প্রতীতি হয়। উপাদান কারণে অবস্থিত কার্যেরই অভিব্যক্তি হয় ও ভিন্ন রূপে প্রতীতি হয় বলে চরম কারণ রূপে অব্যক্ত (প্রকৃতি) স্বীকার করতে হয়।

৫. বিশ্বরূপ যে অধিষ্ঠানের প্রলয়কালে বিলীন হয় এবং যে অধিষ্ঠান থেকে বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়, সেই অধিষ্ঠানই হল প্রকৃতি।

প্রকৃতি হল নির্বিশেষ, নিরবয়ব ও অকারন। তা প্রত্যক্ষগোচর নয়। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি, প্রকৃতির পরিণামই এই জগৎ। প্রকৃতির পরিণাম ঘটে ত্রিবিধ গুনের তারতম্যের ফলে। এই ত্রিবিধ গুন হল সত্ত্ব, রজ: ও তম:। 'সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্' অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হল হালকা প্রকাশক এবং সুখ উৎপাদক। 'উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজ:' অর্থাৎ রজ: গুন হল চঞ্চল, গতিশীল ও দু:খ উৎপাদক। 'গুরূবরণকমেব তম:' অর্থাৎ তম: গুণ ভারী, আবরনকারী এবং এটি ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা ও আলস্য উৎপাদক।[২] সত্ত্ব, রজ: ও তম: গুণের সাম্যাবস্থা থাকলে মহৎ ইত্যাদির আর্বিভাব হয় না। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও প্রকৃতি স্থির থাকে না, তখনও সে সজাতীয় প্রধানান্তরে পরিণত হয়। অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজ: রজ: রূপে এবং তম: তম: রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এরূপ পরিণামকে স্বরূপ পরিণাম বলে। এর ফলে জগতের লয় হয এবং প্রকৃতিতেই তা বিলীন হয়ে যায়। অন্যদিকে, যখন

---

[১] সাংখ্যকারিকা, ১৫

[২] সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভ কং চলঞ্চ রজ:।
গুরু বরণকমেব তম: প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তি:।। (সাংখ্যকারিকা, ১৩)

সৃষ্টির মূহুর্ত উপস্থিত হয়, গুণত্রয়ের তারতম্য হয়, সাম্যাবস্থা থাকে না তখন মহৎ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে। যে পরিণামের ফলে মহদাদি আবির্ভূত হয় তাকে বিরূপ পরিণাম বলে। এর ফলে জগতের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থে বলেছেন–

"সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।।"[৩]

১. সংঘাত বস্তু মাত্রই অপরের প্রয়োজন সাধন করে। একাধিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুই হল সংঘাত। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ: এবং তম: গুণের সমন্বয়ে গঠিত এবং তা জড়াত্মক। কোনো চেতন সত্তার প্রয়োজন সাধনের জন্যই এই সংঘাত পদার্থের উৎপন্ন হয়। সেই চেতন সত্তাই হল পুরুষ।

২. দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে, সংঘাত পদার্থ ত্রিগণাত্মক হওয়ায় সংঘাত পদার্থ যার প্রয়োজন সাধন করে তাকে ত্রিগুনশূন্য হতে হবে। সেই ত্রিগুনশূন্য, বিবেকী, অবিষয়,অসামান্য, অপ্রসবধর্মী ও চেতন সত্তাই হল পুরুষ।

৩. ত্রিগুণাত্মক বস্তু মাত্রই কোন এক নিয়ামকের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণামজাত সকল বস্তুর নিয়ামক হিসেবে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

৪. সুখ, দু:খ, আনন্দ ইত্যাদির অনুভূতি একজন চেতন সত্তারই হয়ে থাকে। তাই প্রকৃতিভূত যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতারূপে পুরুষ অস্তিত্বশীল।

৫. সাংখ্য দর্শনে কৈবল্য শব্দের অর্থ হল দু:খের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, যে নিবৃত্তির দ্বারাই দুঃখ জর্জরিত জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হতে পারে। প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত যাবতীয় বস্তু দু:খস্বরূপ হওয়ায় তাদের এরূপ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং কৈবল্যের জন্য যে প্রবৃত্তি হয় তার কর্তা হিসেবে প্রকৃতি ও মহদাদির অতিরিক্ত এক সত্তা স্বীকার করতে হয়। সেই অতিরিক্ত সত্তাই হল পুরুষ।

অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনে পুরূষকে 'জ্ঞ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ ব্যক্তও নয় আবার অব্যক্ত ও নয়, তা হল উপাদানহীন, নির্গুণ।[৪] পুরুষ হল এক অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় সত্তা। পুরুষ এবং প্রকৃতি নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল কিন্তু অচেতন, পুরুষ চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয়। পুরূষের চরম ও পরম কাম্যবস্ত হল কৈবল্য। ত্রিবিধ দু:খ ( আধিভৌতিক, আদিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক)- এর আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল কৈবল্য। আবার পুরুষ প্রকৃতির সুখ দুঃখ ভোগ করে, প্রকৃতি তখন সার্থকতা লাভ করে। এজন্য প্রকৃতি যেমন পুরূষের অপেক্ষা করে, তেমনি পুরূষ ও প্রকৃতির অপেক্ষা করে। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষ হন খোঁড়া; পুরুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতি অন্ধ।

অবশেষে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের মাধ্যমে প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধির সৃষ্টি হয়। যাবতীয় জাগতিক বস্তুর উৎস হল এই মহৎ যা মানুষের মধ্যে বুদ্ধি রূপে অবস্থান করে। মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম হল অহংকার। এই অহংকারের জন্য পুরুষ নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। তিনটি গুন অনুসারে অহংকার তিন প্রকার- সত্ত্ব গুণের আধিক্যে সাত্ত্বিক অহংকার, রজ: গুণের আধিক্যে রাজসিক অহংকার এবং তম: গুণের আধিক্যে তামসিক অহংকার। এই অহংকার থেকে মন ( অন্তরীন্দ্রিয়), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রীয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক); পঞ্চকর্মেন্দ্রীয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং পঞ্চতন্মাত্র ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)- এর সৃষ্টি

---

[৩] সাংখ্যকারিকা, ১৭

[৪] ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ (সাংখ্যকারিকা, ২)

হয়। আবার পঞ্চ তন্মাত্রের পরিণাম হিসাবে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়। পঞ্চ মহাভূত হল- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরূৎ ও ব্যোম।

এই ২৫ টি তত্ত্ব আবার চারটি ভাগে বিভক্ত—
কেবল প্রকৃতি– প্রকৃতি
প্রকৃতি বিকৃতি– মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র
ন প্রকৃতি ন বিকৃতি– পুরুষ
কেবল বিকৃতি– মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রীয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রীয় এবং পঞ্চ মহাভূত।

সাংখ্য মতে সৃষ্টি বলতে বিবর্তনকে বোঝায়। অর্থাৎ সৃষ্টি বলতে শূন্য থেকে শুরু নয়। সৃষ্টির পূর্বে তা উপাদান কারণে অব্যক্ত রূপে অবস্থান করে। আবার ধ্বংস বলতে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না, রূপান্তর হয়। এটি চক্রাকারে চলতে থাকে।

**বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তে বিবর্তনবাদ:**

রামানুজের বিবর্তনবাদ তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ব্রহ্ম পরিণাম বাদ নামে পরিচিত। রামানুজ তিন প্রকার সত্তা মেনেছেন– ব্রহ্মসত্তা, জীবসত্তা ও জগৎ সত্তা।

রামানুজ ব্রহ্মকে সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলেছেন কিন্তু তা একমাত্র সত্য নয়। কারণ জীব এবং জগৎ ব্রহ্মেরই মতো সত্য। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি নির্গুণ নন, সগুণ; অনন্ত সংখ্যক গুণের আধার। তিনি নির্বিকার হলেও নিষ্ক্রিয় নন। কারণ তার দ্বারা দুটি প্রধান কার্য সাধিত হয়– সৃষ্টি এবং মুক্তি। জীবের কর্ম অনুসারে তিনি সৃষ্টির মাধ্যমে জীবকে সংসারে আবদ্ধ করেন। আবার জীবের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মোক্ষ প্রদান করেন– এটাই ব্রহ্ম লীলা। জগতের মধ্যে অন্তরলীণ হয়ে থাকলেও তিনি জগৎ অতিরিক্ত। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন। রামানুজের মতে বিষ্ণুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং তাঁর নিত্য সহচরী হলেন লক্ষ্মী।

জীব হল জ্ঞান স্বরূপ এবং অজড়। সংসারী জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রান, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমাহার। জীবের উদ্দেশ্য দুটি– ভোগ এবং অপবর্গ। জীব তার কৃতকর্মের ফল ভোগের জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিশেষে সংসার চক্র থেকে মুক্তি বা অপবর্গ লাভ করেন। জীব তিন প্রকার– বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যমুক্ত। বদ্ধজীবের পাঁচটি অবস্থা রয়েছে, যথা- জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং মরণ। জীবের তিনটি অবস্থা হল- স্বর্গ, নরক ও অপবর্গ। পূণ্যার্থীরা স্বর্গে স্থান পান, পাপীরা নরক যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং জ্ঞানীরা জ্ঞান ও উপাসনার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

জগৎ সত্তা হল ব্রহ্মের অচিৎ অংশ। অচিৎ ত্রিবিধ - প্রকৃতি, কাল এবং শুদ্ধ তত্ত্ব। প্রকৃতি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক- সত্ত্ব, রজ: ও তম:। প্রলয়কালে ব্রহ্মকে 'কারণ ব্রহ্ম' বলা হয়। তখন চিৎ ও অচিৎ সুপ্ত অবস্থায় ব্রহ্মের অংশ রূপে বর্তমান থাকে। সৃষ্টিকালীন ব্রহ্মকে 'কার্য ব্রহ্ম' বলা হয়। দ্বিতীয় অচিৎ কাল হল নিরবয়ব, নিত্য এবং অংশ হীন। আর শুদ্ধ তত্ত্ব হল কেবল সত্ত্বগুণাত্বক।

রামানুজাচার্য সৎকার্যবাদী। তিনি ব্রহ্ম পরিণামবাদের কথা বলেন অর্থাৎ জীব এবং জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। তাঁর মতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জীব ও জড় সমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে স্বগতভেদ মেনেছেন। স্বগতভেদ বলতে বোঝায় একই বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভেদ। যেমন একটি গাছের ডাল ও পাতার ভেদ। ব্রহ্ম থেকেই জীও জগতের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়েই। মাকড়শা যেমন তার অভ্যন্তর থেকে তন্তু বের করে জাল

বোনে, ব্রহ্ম ও তেমনি তাঁর চিৎ অংশ থেকে জীবজগৎ এবং অচিৎ অংশ থেকে জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। রামানুজের মতে ব্রহ্মের চিৎ এবং অচিৎ অংশের মধ্যে ভেদ রয়েছে কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এদের মধ্যে 'অপৃকসিদ্ধি' সম্বন্ধ রয়েছে। অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধ বলতে বোঝায় দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যদি এরূপ সম্বন্ধ থাকে যে একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

সর্বোপরি বলা যায়, রামানুজের বিবর্তনবাদ হল ব্রহ্ম থেকে জীব ও জগতে রূপান্তর মাত্র। সৃষ্টির আগ জীব ব্রহ্মের চিৎ অংশে এবং জড় জগৎ ব্রহ্মের অচিৎ অংশে অব্যক্ত রূপে উপস্থিত।

**শ্রী অরবিন্দ দর্শনে বিবর্তনবাদ:**

বিবর্তনবাদ নিয়ে বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনবাদের কথা বলেন, যেখানে বলা হয় বিবর্তন হল সময়ের সাথে সাথে কমবেশি একই আকৃতি ও বিষয়ের পুন:সংগঠন মাত্র। এ জাতীয় বিবর্তন একই সত্তার পুনরাবৃত্তি মাত্র। কেউ উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের কথা বলেন, যেখানে বিশ্বাস করা হয় বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন কিছুর সৃষ্টি হয়। আবার কেউ যান্ত্রিক বিবর্তনের কথাও বলেছেন। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা হয় পূর্ব শর্তের ভিত্তিতে। কিন্তু এইসব দার্শনিকদের সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের বিবর্তন তত্ত্বের ভাবনার কোনো মিল নেই। অরবিন্দের বিবর্তনবাদ হল অখণ্ড বিবর্তন (Integral Evolution). কেননা তাঁর বিবর্তন তত্ত্বে দেখানো হয়েছে পরম সত্তার সুপ্ত চেতনা থেকে জড়, প্রান এবং শেষে অতিমানস স্তরে রূপান্তর প্রক্রিয়া। তিনি জড়, প্রান ও মনের সাথে এক আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে ঐশ্বরিক সত্তার সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

শ্রী অরবিন্দের মতে সত্তা এক। কিন্তু তিনি যখন তার স্তরগুলি ব্যাখ্যা করেন তখন সত্তার স্বরূপ বহু। তিনি সত্তার আটটি স্তরের কথা বলেন— ১. শুদ্ধ সত্তা (pure existence) ২. চিৎ শক্তি (consciousness force) ৩. আনন্দ (bliss) ৪. অতিমানস (super mind)— এই চারটি ঊর্ধ্বলোকস্থ। ৫. মন (mind) ৬. চিদাত্মা (psyche) ৭. প্রান (life) এবং ৮. জড় (matter)– এ চারটি নিম্নলোকস্থ। তিনি পরম সত্তাকে 'সচ্চিদানন্দ' বলেছেন, যা জড়সহ সকল কিছুর উৎস। শুদ্ধ সত্তা সামান্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিরপেক্ষ ও অসীম শক্তির আধার। এর ব্যাখ্যা অসম্ভব ও অনির্বচনীয়। চিৎ অর্থাৎ চেতন শক্তিকে অরবিন্দ 'মা' (the mother) বলেছেন। এই শক্তি জগতের সৃষ্টি ও ধাত্রী। চেতনার মতো, আনন্দের মতো এটি সর্বত্র বিরাজমান। দিব্য চিৎ শক্তির প্রভাবে অহমাত্মক কামনা বাসনা দূর হলে আনন্দ প্রকটিত হয়।

অরবিন্দ জগৎ সৃষ্টির দুটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন— অবরোহণ (Descent) এবং আরোহণ (Ascent)। অবরোহণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বের গতি অধোমুখী। আবার বিশ্বের গতি যখন স্বরূপে অবস্থিত সত্তার দিকে অগ্রসর হয় তখন তাকে বলা হয় আরোহণ। এই আরোহণ প্রক্রিয়া সম্ভব হয় সংকোচন (involution) এবং বিবর্তন (evolution) এর মধ্য দিয়ে। শ্রী অরবিন্দের মতে বিবর্তনের পূর্বাবস্থা হল সংকোচন বা কুণ্ডলীকরন (involution) । বিবর্তন সম্ভব হয় কারণ কুণ্ডলীকরন প্রক্রিয়াটি ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। এই দুই পদ্ধতির মধ্যেই যুক্ত আছে সত্তার আটটি স্তর। আধ্যাত্ম শক্তি প্রথমে জড়, প্রাণ, মন ইত্যাদি নিম্নস্তরে অবরোহণ করে। তারপর তা শুদ্ধ সত্তা ইত্যাদি উচ্চস্তরে আরোহণ করে। জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, কেননা প্রাণ জড়ের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় ছিল। শ্রী অরবিন্দের মতে বিবর্তন ঘটে তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে– প্রশস্তকরণ (weidening), উন্নতিসাধন (leightening) এবং অখন্ড সমন্বয়করণ (integrations)। প্রশস্তকরণ পদ্ধতিতে নতুন তত্ত্বের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়। উন্নতিসাধন পদ্ধতিতে একধাপ থেকে অন্য ধাপে আরোহণ করা হয় এবং অখণ্ড সমন্বয়করণ পদ্ধতিতে অখন্ডতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী অরবিন্দ মনে করেন বিবর্তনের হাত ধরেই জড়

প্রাণে উন্নীত হয় এবং প্রাণ মনে উন্নীত হয় এবং তারপর মন অপেক্ষা করে পরবর্তী স্তর অর্থাৎ অতিমানস স্তরে পৌঁছানোর জন্য। এই মন যেমন অতিমানস স্তরে যেতে পারে তেমনি আবার অতিমানস স্তর থেকে নেমেও আসতে পারে।

মন থেকে অতিমানস স্তরে পৌঁছানোর জন্য কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। স্তরগুলি হল— ১. Higher mind বা উচ্চতর স্তর। এই স্তরে সাধারণ মনের মতো সত্যের অন্বেষণ করতে হয় না। ব্যক্তি চিন্তার মাধ্যমে সাক্ষাৎ ও স্বত:স্ফূর্তভাবে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে। ২. Illumined mind বা দীপ্ত মন। এই স্তরে শক্তি ও প্রখরতা অনেক বেশি। এখানে দিব্য আলোকের মধ্য দিয়ে সত্য মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। ৩. Intuition বা সজ্ঞা। এখানে নিবিড় ও নির্ভুল সত্য দৃষ্টি, সত্যচিন্তন ও সত্য উপলব্ধি হয়। ৪. over mind বা অধিমানস। এটি অতিমানস এর পূর্ববর্তী স্তর। এখানে খন্ড খন্ড রূপে অখন্ডের ধারণা থাকে। ৫. super mind বা অতিমানস স্তর। এই স্তরে অখণ্ড সত্য, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি একইসাথে কাজ করে এবং মানুষের প্রাণ, শরীর ও মনকে ঐশ্বরিক জীবনে পরিণত করে। এই অতিমানস স্তরে সব বিজ্ঞানময় পুরুষ যে একই হবে এমন নয় কিন্তু সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য থাকবে। সে নিজেকে সকলের সাথে একাত্ম মনে করবে এবং প্রতি ক্ষণে, দেহের প্রতিটি কোষে স্বয়ং ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করবে।

পরিশেষে বলা যায়, বিবর্তনের চরম ও পরম লক্ষ্য হল দিব্যজীবন (life devine) । অরবিন্দের বিবর্তন হল আধ্যাত্মিক বিবর্তন, যার দ্বারা দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। বিবর্তনের পূর্বাবস্থা হল কুণ্ডলীকরন এবং শূন্য থেকে বিবর্তন সম্ভব নয়। বিবর্তনের পূর্বে পরম ব্রহ্ম অব্যক্ত অবস্থায় জড়ের মধ্যেই নিহিত ছিল। যোগ বা সাধনার দ্বারা; প্রশস্তকরণ, উন্নতিসাধন ও অখণ্ড সমন্বয়করণের মাধ্যমে ক্রমানুসারে জড়, প্রাণ, মন এবং শেষে অতিমানস স্তরে রূপান্তরিত হয়।

উপরিউক্ত তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে; সাংখ্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত ও অরবিন্দের বিবর্তনবাদের মধ্যে যেমন কিছু মিল রয়েছে তেমনি কিছু অমিলও রয়েছে।

**মিল:**

১. তিনটি সম্প্রদায়ই সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী, যেখানে বলা হয় উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে নিহিত থাকে। এক্ষেত্রে সাংখ্যরা প্রকৃতি পরিণামবাদের কথা বলে, রামানুজ ব্রহ্ম পরিণামবাদের কথা বলে এবং অরবিন্দ অখণ্ড বিবর্তনবাদের কথা বলে।
২. তিনটি সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন শূন্য থেকে বিবর্তন সম্ভব নয়।
৩. তিনটি সম্প্রদায়ই জড় থেকে চেতনায় উত্তরণের কথা বলেন।
৪. এদের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রণালীও একই।

**অমিল:**

১. সাংখ্য মতে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিবর্তন ঘটে এবং জগৎ সৃষ্টি হয়। রামানুজের মতে ব্রহ্মের স্ব ইচ্ছায় বিবর্তন ঘটে। আবার অরবিন্দের মতে জগৎ সৃষ্টি হয় দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে– অবরোহণ এবং আরোহণ।
২. সাংখ্য বিবর্তনবাদের লক্ষ্য হল পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি বা কৈবল্য লাভ। রামানুজের বিবর্তনবাদের লক্ষ্য হল জীবাত্মার সাথে পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের মিলন। অরবিন্দের বিবর্তনবাদের লক্ষ্য শুধু মুক্তি নয়, জড় বা মানবদেহের দিব্যজীবন লাভ।
৩. সাংখ্য মতে প্রকৃতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম বলে কিছু নেই। রামানুজ বলেন প্রকৃতি ব্রহ্মেরই অংশ।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১. অনির্বাণ (অণু.)। দিব্যজীবন। শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, ২০০১।
২. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১৬।
৩. চৌধুরী, রমা। বেদান্ত দর্শন। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০২৫।
৪. পাল, শ্রী বিপদভঞ্জন। সাংখ্যকারিকা। সদেশ, কলকাতা, ২০২১।
৫. ভট্টাচার্য, ঝর্ণা। অদ্বৈতবেদান্ত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৭।
৬. রায়, দিলীপকুমার। শ্রী অরবিন্দের দর্শন। শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, ১৯৩১।
৭. সরস্বতী, শ্রী প্রজ্ঞানানন্দ। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস। শ্রী শঙ্করমঠ, বরিশাল এবং সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৭।
৮. Gupta, Anima Sen. The Evolution of Sankhya School of Thought. Munshiram Manhorlal publisher, 2nd edition, 1986.